দৈনিক বাংলা

011

তারিখ ... 23 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 4 ...

তরুণ মৃত্যু এবং পরীক্ষা

23 MAR 1988

একেক সময় একেকটা খবর নিয়ে খুব হইচই হয়। কখনও খেলা, কখনও নির্বাচন। হরতাল কারফিউ, বোমা। এখন বিশেষ খবর এসএসসি পরীক্ষা। খবরের মত খবর। উত্তেজনা আছে ট্র্যাজেডী আছে কমেডী আছে—এই এসএসসি পরীক্ষার খবরে জীবনের সব রকম কাহিনীর উপাদান পাওয়া যাবে খুঁজলে। গুলি, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, বোমা, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ থেকে শুরু করে সাফল্য অথবা মৃত্যুর করুণ পরিণতি সবই আছে। এক একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে জীবন নাটকের বিচিত্র অভিনয় হয়ে যাচ্ছে নিত্য। এসএসসি পরীক্ষা এত যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—একথাটা এমন করে আর কখনো বোঝা যায় না।

কত গুরুত্বপূর্ণ? পরীক্ষার্থীদের জীবন-মরণ এসএসসি পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে বলা কি যায়? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না? হয়ত হয়। তবু কেউ বলে ফেললে একেবারে ভুল বলা হয়। তাও বুঝি জোর দিয়ে বলা যায় না। এসএসসি পরীক্ষার ওপর জীবন কতখানি নির্ভর করে তা ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্য। ফলে পরিচয় কিছু মিলবে, পরে পরবর্তী কর্মফলে। কিন্তু মরণ? কারও কারও ক্ষেত্রে মরণও নির্ভর করে বইকি এই পরীক্ষার ওপর আর মরণ বিষয়টা এমনই যে সেখানে ক্রম প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। হাতেনাতে সব খেলা চুকিয়ে দেওয়াই মরণের ধর্ম।

যেমন হয়েছে সাতক্ষীরার শম্পারানী মন্ডলের বেলায়। এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর বড় হরফে পত্রিকার প্রথম পাতাতেই আছে। শম্পারানীর খবরটা তেমন প্রাধান্য পাবার মত নয়। শেষের পাতার ছোট হরফের খবর। পঞ্চদশী ওই পরীক্ষার্থিনী আত্মহত্যা করেছে এনাজিন খেয়ে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্যে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

খবর যত ছোটই হোক, মন খারাপ করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। মৃত্যু সব সময়েই করুণ। পঞ্চদশীর মৃত্যু করুণতর। যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে—মনে পড়ে যায়। টিন এজ। এ বয়সটার সব ভাবাবেগই জোরালো লজ্জা, ভয় মান, অভিমান। কোন স্থূল নিয়মের শিকার হবার জন্যে এ সময়ে মন প্রস্তুত থাকে না। নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হবার লজ্জা যে শম্পারানীর মনে কঠিন হয়েই বেজেছিল তা বোঝা যায়। হয়ত তার মনে হয়েছিল, এ কলংক আর জীবনেও ঘুচবে না, যেমন মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গিন্নী গল্পের আশুর। স্কুলের পন্ডিতমশাই আশুকে ছোট বোনের সঙ্গে পুতুল খেলতে দেখেছিলেন। স্কুলে অন্য সব ছেলেদের সামনে সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি আশুর নামকরণ করলেন গিন্নী। আশুর মনে হয়েছিল, এ কলংক থেকে সে আর কখনও মুক্তি পাবে না। সে মরমে মরে গিয়েছিল। আর শম্পারানীকে সত্যি সত্যি মরতে হল। তার অপরাধটাও পুতুল খেলার তুলনায় আরেকটু জটিল। কলংকের মসীবর্ণে তার গোটা ভবিষ্যৎই বুঝি অন্ধকার মনে হয়েছিল। এ গ্লানি তার কাছে বহনযোগ্য মনে হয়নি।

একটি বালিকার অকালমৃত্যু, আত্মহত্যা সমাজের সামনে,

কণিকা মাহফুজ

শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে পুরনো প্রশ্নগুলি আবার নতুন করে টানে। এই কলংক এই লজ্জা—এ কার? শম্পারানীর একার? নাকি তা এই সমাজেরই এই শিক্ষা ব্যবস্থার? এ কেমন শিক্ষা ব্যবস্থা? পরীক্ষা নিয়েই বা এ কেমন নাটক? পরীক্ষা যদি এমন জীবন-মরণ সমস্যাই টেনে আনবে, তাকে কেন্দ্র করে যদি এমন একটা প্রায় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধাবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে—সংঘর্ষগুলি লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস, ১৪৪ ধারা ইত্যাদি তাহলে সংশ্লিষ্ট সকলে অন্য সময় কোথায় ছিলেন? এত যে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা—যারা দেন তাদের জন্যে এবং যারা নেন তাদের জন্যেও—তার জন্যে প্রস্তুতির এ কেমন ধরন? যেন নকল করা এবং নকল ঠেকানোই উভয় পক্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। একে অন্যের প্রতিপক্ষ অবশ্যই। প্রতি পক্ষকে শায়েস্তা করার অন্যতম পন্থা বহিষ্কার ক্রিয়া।

সত্যিই বলতে এই বহিষ্কার কর্মকান্ড সম্প্রতি এতই জোরালো যে কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা চলছে না বহিষ্কার—তা বুঝে ওঠা মুশকিল। নিত্য খবর—এক হাজার বহিষ্কৃত হয়েছে, দুই হাজার বহিষ্কৃত হচ্ছে, ছাত্র বহিষ্কৃত হয়েছে, শিক্ষক হয়েছে পরিদর্শকও হয়েছে। যত বহিষ্কার ততই যেন গৌরব। এরপর যখন পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে তখন দেখা যাবে পাশের চেয়ে ফেলের হার কম নয়। অন্তত আধাআধি খেয়া। সারা শিক্ষা ব্যবস্থা জুড়ে আছে এক নেতিবাচক প্রক্রিয়া। তরুণ সমাজে নৈরাশ্যবাদ ছড়িয়ে পড়লে দোষ দেয়া যাবে কাকে?

কোন এক পক্ষকে কিছুর জন্যেই দায়ী করা যায় না, একথা ঠিক। ছাত্র শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বিভাগ, সমাজ—সব মিলিয়েই তো ব্যবস্থা। তবে চালু ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুভূতি জাগায় না। জ্ঞানলিপ্সা কথাটায় বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। ও শব্দটা উচ্চারণ করতে সংকোচ হয়। পাস হবার জন্যে প্রয়োজনীয় জানাজানি বলাটাই মানানসই। পাস করার ইচ্ছাটা বাস্তবতা প্রসূত। সহজাতও কিছুটা। দেখা গেছে সব কালেই তা আপনিই গজায়। কিন্তু এই পাস করার ইচ্ছার সঙ্গে জানার ইচ্ছাটাকে মেলানো যায় না। তেমন কোনো ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি। পরীক্ষা কেন্দ্রকে যুদ্ধ সাজে সাজাবার মনোযোগী আয়োজন দেখলে মনে হয়, পরীক্ষা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সত্যিই মাথা ব্যথা আছে। কিন্তু সারা বছর পরীক্ষার্থীরা পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে কিনা, ক্লাস হয় কি হয় না—এসব বিষয়ে তদারকির ব্যবস্থাটা আদৌ সন্তোষজনক নয়। শেষমেষ—এক পক্ষ নকল করে পার পেতে চায়, অন্য পক্ষ নকল ধরে বহিষ্কার করতে চান—দুই প্রতিপক্ষের পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র যুদ্ধাঙ্গন হয়।

বহিষ্কার ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো জোরালো বক্তব্য নেই। যদিও শম্পারানীর করুণ পরিণতিতে দুঃখিত না হয়েও পারা যায় না। সত্যি বলতে এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় কেমন ভয় ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই প্রক্রিয়ায় শম্পারানীর মত আরও অনেক তরুণ প্রাণ বিভ্রান্ত হতে পারে। আরও প্রাণ নষ্ট হতে পারে। সমস্যা জটিল। শুধু বহিষ্কারে এ সমস্যার সমাধান হয়নি—একথাটা বলা যায়। ভিন্ন পথও চিন্তা করতে হবে। সমস্যার গভীরে না পৌঁছাতে পারলে এর সমাধানও বুঝি হবার নয়।